কালের কণ্ঠ

তারিখ ..15 JUN 2016
পৃষ্ঠা ...২৪... কলাম... ......

শফিকুল ইসলাম ▷

শিক্ষার মান পতনের কারণ ও প্রতিকার

> প্রশাসনের ব্যর্থতার সুযোগে এবং অসাধু রাজনীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রশ্রয়ে লুটেরা, কালো টাকার মালিকদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় বন্দি হয়ে পড়েছে। গত দু-তিন দশকে এসব ব্যবসায়ী এত টাকার মালিক হয়েছেন যে তাঁরা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই জিম্মি করে ফেলেছেন। শিক্ষা-বাণিজ্যে দায়বদ্ধতার অভাব ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকা, পাঠক্রম বৈষম্য ও পদ্ধতিগত জটিলতা ইত্যাদি কারণেও মানের অধঃপতন ঘটছে

কোয়ালিটি এডুকেশন বা মানসম্পন্ন শিক্ষা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয় জীবনের নানা স্তরে। এ আলোচনার দুটি দিক থাকতে পারে। নানা কারণে শিক্ষার গুণগত মানের পতন প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসতে পারে। আবার স্বাভাবিকভাবে গুণগত উন্নয়নের দাবি উঠতে পারে। পেছনের কারণ যাই হোক না কেন, মানোন্নয়নের দাবিটি যে ইতিবাচক বলাই বাহুল্য। যেকোনো জাতির অগ্রগতি ও শক্তিশালী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য এ দাবি পূরণ অত্যন্ত জরুরি। তবে দাবি ঠিকঠাক মেটানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দাবি উত্থাপনের বাস্তবতা অনুধাবন ও বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো যথাযথভাবে নিরূপণ।

মানোন্নয়নের দাবির ক্ষেত্রে দুই ধরনের বাস্তবতা রয়েছে। একটি সামাজিক ও অন্যটি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয়। সামাজিক বাস্তবতা ভিত্তিটি গড়ে দেয়। কোনো জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের গড়পড়তা সংস্থান হলে শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রতি নাগরিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অন্যদিকে অর্থনীতি বিকাশের বিশেষ স্তরে সমাজে শিক্ষিত শ্রমের চাহিদা তৈরি হয়। গত শতকের শেষ প্রান্তিক থেকে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। তার সঙ্গে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজসহ অন্যান্য শিল্পেরও বিকাশ ঘটছে। তা ছাড়া এ সময়ে সেবা খাতের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তার ওপর বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের ফলে বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববাজারে শ্রম রপ্তানি। এসব মিলে দেশে শিক্ষিত, দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা তৈরি হয়েছে বিপুল পরিমাণে। অন্যদিকে আয় ও সক্ষমতা বাড়ায় মানুষের মধ্যে নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রবণতা বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতাও প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে।

শিক্ষার এরূপ সামাজিক বাস্তবতায় রাষ্ট্রের ওপর সামাজিক চাহিদা পূরণে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটানোর দায়িত্ব বর্তায়। বর্তমান সরকার তাই করার চেষ্টা করছে। ২০০৮ সালে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী সরকার জাতীয় উন্নয়নে গতি আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়। শিক্ষা তার অন্যতম একটি। স্কুলপর্যায়ে বিনা মূল্যে বই প্রদান, নারীশিক্ষা প্রসারে বৃত্তি প্রদান, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, বিশেষভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দান ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

নানামুখী পদক্ষেপের একটি ছিল এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ানো। এ কাজটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় ছিল। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের আগে পাসের হার গড়ে ৪০-৫০ শতাংশের বেশি ছিল না। পাসের এ হার কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। শুধু তাই নয়, এটি ছিল যুবশক্তি ও অর্থের বিপুল অপচয়। তাই পাসের হার অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ও যুক্তিসংগত মাত্রায় উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং অত্যন্ত তাড়াহুড়ায় দু-তিন বছরের মধ্যেই এই হার ৮০-৯০ শতাংশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়। তা ছাড়া পিএসসি, জেএসসি আয়োজনের মাধ্যমে শতভাগ পাসের রাজনৈতিক প্রচার প্রকল্প শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়াবহ অবক্ষয় বয়ে আনে। অল্প সময়ের ব্যবধানে এইচএসসি পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায় এবং এসব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার অপ্রতুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে। এদের স্থান করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সীমাবদ্ধতার সুযোগে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে। আর এটিই সত্য যে কোনো দাতব্য উদ্দেশ্যে নয়, বরং অন্য ১০টি ক্ষেত্রের মতো পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ধসটা নেমেছে এখানটাতেই। শিক্ষাকে পণ্য করায় নয়, বরং পণ্য করতে না পারাই আমাদের মূল সমস্যা। সামাজিক বিকাশের বর্তমান স্তরে যখন শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং সরকারি আয়োজন তা মেটাতে অক্ষম, সে সুযোগে শিক্ষাকে অসাধু ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটে নেওয়ার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। শিক্ষাকে যথাযথ পণ্যে পরিণত না করে অর্থাৎ মানসম্পন্ন বিনিময়যোগ্য শিক্ষা প্রদানের পরিবর্তে সার্টিফিকেট বিক্রির মহোৎসব শুরু করেছে। এটি স্পষ্টতই সামাজিক প্রতারণা। পাবলিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাড়ায় পাঠদানে অত্যধিক আগ্রহী হওয়ায় তাঁদের পক্ষে নিজ প্রতিষ্ঠানে যথাযথ দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেক মানসম্পন্ন শিক্ষকও অর্থের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারছেন না। তা ছাড়া কোচিং সেন্টারগুলো প্যারালাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করে দিচ্ছে। এসব মিলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এখানেই শিক্ষা প্রশাসনের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে, আসে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন। জাতীয় জীবনে শিক্ষা খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পাবলিক-প্রাইভেট নির্বিশেষে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সরকারের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা অনিবার্য। এ দায়িত্ব শিক্ষা প্রশাসনের, যা পালনে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এর জন্য প্রশাসনিক অসাধুতা দায়ী হলেও শিক্ষা নিয়ে রাজনীতিই এর প্রধান কারণ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেনতেন প্রকারে পাসের হার না বাড়িয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তা করা হলে শ্রম ও সময় বেশি লাগত ঠিকই, তবে যোগ্য মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতি অনেক বেশি উপকৃত হতো। প্রশাসনের ব্যর্থতার সুযোগে এবং অসাধু রাজনীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রশ্রয়ে লুটেরা, কালো টাকার মালিকদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় বন্দি হয়ে পড়েছে। গত দু-তিন দশকে এসব ব্যবসায়ী এত টাকার মালিক হয়েছেন যে তাঁরা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই জিম্মি করে ফেলেছেন। শিক্ষা-বাণিজ্যে দায়বদ্ধতার অভাব ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকা, পাঠক্রম বৈষম্য ও পদ্ধতিগত জটিলতা ইত্যাদি কারণেও মানের অধঃপতন ঘটছে। নিয়ন্ত্রণহীন অর্থলগ্নি ও মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন এবং অসাধু প্রতিযোগিতার ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সাপ্লাই, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি গর্হিত অপরাধের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জড়িয়ে পড়ছে। তার ওপর পাবলিক পরীক্ষায় ৯০-৯৫ শতাংশ পাসের রাজনৈতিক তাগিদ ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকদের এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করছে। এসবের ফলস্বরূপ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই আজ দুর্নীতিগ্রস্ত, রুগ্‌ণ ও নীতি-আদর্শবিবর্জিত ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি শিক্ষার এ অশুভ চিত্র সমাজের অপরাপর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়া অবক্ষয়ের জন্য যে বহুলাংশে দায়ী, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। এ পরিস্থিতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত অন্ধকারে পথ হারাবে, যার আলামত এরই মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

এ থেকে মুক্তির উপায় কী হবে সেটিই এখন আসল প্রশ্ন। আশার কথা হলো, শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি সম্পর্কে মানুষ শুধু সচেতন হচ্ছে তাই নয়, এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে, যা অভিভাবক ফোরাম, নাগরিক সমাজ, এমনকি কোনো কোনো সংসদ সদস্যের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই এখন সময় হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থাকে সোনালি ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লাভজনক খাতে পরিণত করতে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শিক্ষা প্রশাসনের অধীনে বৈষম্যহীন, সুষ্ঠু ও মানসম্পন্ন, জনমুখী ও উৎপাদনশীল শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে সচেতন অভিভাবক, নাগরিক সমাজ ও সৎ রাজনীতিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার। কেবল জনগণের আন্দোলনই সাফল্যের গ্যারান্টি হতে পারে।

লেখক : শিক্ষক, লেখক ও অনুবাদক